আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পবিশ্ব

শুভঙ্কর ঘোষ

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় বিরল ব্যতিক্রমী কথাকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। অন্তত বারো বছর আগে, কোনো চিন্তাজীবী এতদূর ভেবেছিলেন বা বুঝেছিলেন, যুদ্ধ-দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-দেশভাগের আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলার সর্বব্যাপী শূন্যতার সাহিত্যায়নে দু'চারজন স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত কথাকারদের মধ্যে আখতারুজ্জামান অন্যতম। অর্থাৎ তাঁর সময়কালেই শুধু নয়। পূর্বাপর বিবেচনাতেও, আখতারুজ্জামান একজন মৌলিক কথাকার। তিনি সময়ের ভাষ্যকারও বটে। এর অর্থ এই নয় যে তিনি উপস্থিত কালের দাবি মিটিয়েছেন, বরং একথা বলা এইজন্য যে, তাঁর সময়বীক্ষা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও গভীর। আখতারুজ্জামানের নিজের কথায়—

> আমার সময় মানে তো একেবারে অল্পস্বল্প ব্যাপার নয়। মানুষ যতদিন কাজ করে সবটাই তার সময়ের আওতার ভিতরেই পড়ে। জন্মের পর প্রথম কান্না থেকে শুরু করে শেষ নিঃশ্বাসটি ছাড়া পর্যন্ত সবই তার কাজের অন্তর্গত। চোখের মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শেষবারের মতো ছাদের সিলিং দেখে নেওয়া - মুমূর্ষু মানুষের পক্ষে তাও কি কম শ্রমসাধ্য কাজ?
> যতোদিন বাঁচি, সবটা সময় আমার বলেই গন্য করবো।
>
> (আমি ও আমার সময়ে)

এই সময়কে সনাক্তকরণ' তাঁর দায় তাঁর সংকট। তাই নিরলস তাঁর প্রয়াস, লড়াই-এর প্রয়াস। শুত্তর, কুত্তায় তাঁর মনোযোগ, ইঁদুরের বাড়বাড়ন্ত তাঁর সহোর সীমা পেরিয়ে যায়। তাঁকে মরিয়া হয়ে বলতেই হয়, যা তিনিই বলতে পারেন—

> হয়তো কে জানে, ভবিষ্যতের সময় আমার এই টুটাফাটা পঙ্গু ও রুগ্ন সময়কে সেই ইতর জীবনটির সঙ্গে লড়াই করবার সময় বলে সনাক্ত করবে। সেই ভরসাতেই বাঁচি। তোতলা কলম নিয়েও তাই একটু আধটু লিখতে চেষ্টা করি।
>
> (আমি ও আমার সময়)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩-৪ জানুয়ারি ১৯৯৭) মাত্র তিপ্পান্ন বছরের জীবনকাল সময়বীক্ষার পরিসরেই জীবন, রাজনীতি, সমাজ, মানবচরিত্র, রাষ্ট্র, জাতি, দেশ ও আন্তর্জাতিক খোঁজখবরকে শিল্পিত করেন অসম্ভব সচেতনতায়; বহুপ্রসূ লেখক না হলেও তাঁর লিখনসীমায় জীবনভাষ্যের বিচিত্রতা ও গভীরতা ধরা পড়েছে শিল্পবাস্তবের যাবতীয় গুণপনা নিয়েই। মোট পাঁচটি গল্পগ্রন্থ ও দুটি উপন্যাস নিয়ে আপাতত ইলিয়াসের সাহিত্য সমগ্র। ১৯৯৩-এ 'চিলেকোঠার সেপাই' এবং ১৯৯৬ -এ 'খোয়াবনামা' উপন্যাস প্রকাশিত। আমাদের আলোচ্য তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হ'ল—'অন্য ঘরে অন্য স্বর' (১৯৭৬), 'খোয়ারি' (১৯৮২), 'দুধেভাতে উৎপাত' (১৯৮৫), 'দোজখের ওম' (১৯৮৯), 'জল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭)।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দুটি উপন্যাস-ই অসামান্য জীবনবাস্তবতা ও শিল্পকৃতির পরিচয় বহন করে। তাঁর শিল্পরুচি শিল্পবীক্ষা ও জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা মিলবে তাঁর 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' প্রবন্ধ সংকলনে। মার্কসীয় চৈতন্যে আস্থাশীল চিন্তায় মননে শিল্পকর্মে কখনো স্থূল বাস্তবকে আঁকড়ে থাকেননি। প্রত্যক্ষ বাস্তবটাই তাঁর কাছে যথেষ্ট নয়। কিন্তু তিনি 'কেন লিখি' প্রশ্নের জবাবে বলতে চেয়েছেন, —'আমার ও আমার আশেপাশের পরিচিত সকলের জীবনযাপনকে ভালোভাবে অনুভব করবার জন্য গল্প লিখি, উপন্যাস লিখি।' ইলিয়াসের আবির্ভাবকে বলা সাহিত্যে 'প্রবলতম ঘটনা' বলবার তাৎপর্য এইখানে যে, ক্লিশে হয়ে যাওয়া বাংলা যেমন তিনি উদ্ধার করেন, তেমনি তাঁর সাহিত্যে বিরল ও অভিনব ঝোঁককেও চিহ্নিত করার দুরূহ শিল্পব্রতে তিনি মনোযোগী থাকেন। তাঁর গল্পে নিম্নবর্গের মানুষ আশ্রয় পায়, অস্বচ্ছল মানুষ জায়গা দাবি করে, মর্যাদা দাবি করে, আবার যদি এই শ্রেণীর বাইরের চরিত্রও আসে, তার পিছনে বর্গের মানুষকে বাদ দিয়ে গড়ে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রাম নয়। সময় ও সমাজের রূপান্তর বাংলার গ্রামকে তো এক জায়গায় স্থির থাকতে দেয়নি, পরিবর্তিত হয়েছে।

শুধু গ্রামীণ মানুষই নয়, মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরের মানুষ নিয়েও তাঁর কারবার। রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা' থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পের যে বিবর্তন ও বিকাশবৃত্তান্ত আমাদের অধিগত, সেক্ষেত্রে সাহিত্যপরম্পরার সত্যকে স্বীকার করে নিয়েই বলা যায় আখতারুজ্জামান অতীব স্বতন্ত্র। বাংলাদেশে হাসান আজিজুল হক যেমন একটি শ্রদ্ধেয় নাম, তাঁর পাশে এই লেখকেরও একটি স্বাধীন অবস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। কারো কারো তাঁর লেখাপাঠে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে মনে পড়ায়। কিন্তু তিনি তাঁর স্বকীয়তা হারিয়ে এদের দ্বারা গ্রস্থ নন। একথাও বলতে হবে আখতারুজ্জামানের গল্পপাঠ নিছক, আনন্দপাঠ নয়, সহজপাঠ নয়, অবশ্যই তা বহুমাত্রিক জীবনপাঠও বটে। বিষয়ের ভাঁজে ভাঁজে, গল্পের পরতে পরতে নতুন বিষয়ের অভিমুখ বা নতুন গল্পের

উৎসার; শিবনারায়ণ রায় তাঁর গল্প নিয়ে চমৎকার বিশিষ্টতা নির্দেশ করতে চেয়েছেন—

> ‘অন্যঘর অন্যস্বর’ তীরের মতো ঋজু, ধানীলংকার মতো বদমেজাজী এবং পরনারীর মতো আকর্ষণীয়। এই বইয়ের গদ্য শুকনো খটখটে, প্রায় সবটাই ভাঙা, ভাঙার উপরে নরম সবুজ গাছপালা জমেছে, এমনও মনে হয় না। কোথাও একটু দয়া নেই, জল দাঁড়ায় না— বাস্তব ঠিক যেমনটি, তেমনি আঁকা, ক্যামেরাও এর চেয়ে নিখুঁত ছবি তুলতে পারে না। শ্মশানের মড়া পুড়িয়ে পুড়িয়ে চণ্ডালের যে অবস্থা ইলিয়াসেরও তাই। সব কটি চশমা খুলে বসে আছেন, অথচ আমাদের সাহিত্যে চশমার তো অন্ত নেই— ক্যোঁৎ ক্যোঁৎ আবেগের চশমা, ধর্মের সম্প্রদায়ের রঙিন চশমা কতো আছে। ইলিয়াসের খোলা চোখে দৃষ্টি সমকালীনতার মলটুকু দেখে নেয়, দাঁত নখ সবই বাজপাখির মতো তড়িঘড়ি ও সোজাসুজি, আর সেইটুকুই তিনি লিখতে বসে যান। এই জন্যেই তাঁর লেখায় হাবাগঙ্গারামের প্রেম নেই। দাম্পত্যজীবন প্রেমপ্রীতি পিতৃভক্তির বাৎসল্য ইত্যাদির উপরে যেন তিনি বাজ ফেলেছেন।
>
> (কথাসাহিত্যের কথাকতা)

আখতারুজ্জামানের লিখনকলা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশস্তির অন্তর্নিহিতে যদি হসানের প্রচ্ছন্ন শিল্পের অভিযোগ থাকে, তবে তা বড় কিছু নয়। আখতারুজ্জামানের ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ থেকে ‘জল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল’ অবধি গল্পধারায় একটি ন্যায় বা ক্রম পাওয়া যাবে, কোনো গল্পই তাঁর প্রক্ষিপ্ত নয়, আসলে লেখকের জীবনবোধে যদি ভারসাম্য থাকে তবে তাও তাঁকে নান্দনিকতার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সহায়তা করে। আখতারুজ্জমানের গল্পসমূহে স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে যাওয়া, চরিত্রের বিচিত্রতা, পরিস্থিতির পটবদল— এইসব খুঁজে পেলে বলা যাবে না লেখক ক্রমান্বয়ে একই কথা বলেছেন বা স্বীকার করা যাবে না যে তাঁর গল্পের চিন্তার ক্রমবিকাশ নেই। ‘অন্য ঘর অন্য স্বর’ থেকে ‘দোজখের ওম’ অবধি গল্পসমুহের পাঠভুবন যে কতটা অভিনবত্ব এনে দিতে পারে তার ব্যাখ্যাও এভাবে পাওয়া যায়—

> যে ঘরের মানুষের স্বপ্ন তাঁর প্রথম দিকের গল্পে শোনা যায় ক্রমশ তাঁরা ও তাঁদের স্বর পালটে গেছে। চরিত্রে এসেছে পরিবর্তন, এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়, খোয়ারি ভেঙে তাঁরা দ্যাখে তাঁদের দুধভাতের অনটন এবং তাঁর এই উপলব্ধিতে পৌঁছন, যে অবস্থানে তাঁরা আছেন, রীতিমতো তা দোজখ। এমন বোধোদয় শুধু গল্পে চরিত্রসমূহের নয়, এই সঙ্গে লেখকের মনোযোগ, চিন্তার ক্রমবিকাশও কি আমরা আবিষ্কার করতে পারছি না? গল্পের বিষয়ান্তরে, পটভূমি বিস্তৃত হয়ে বাংলাদেশের ভূভাগ স্পর্শ করে। (সুশান্ত মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প, নতুন স্বর, সুর ও আস্বাদ)

আসলে এই বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়; নরনারীর যৌনতা, যৌনজীবনের মনস্তত্ব, পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক জীবনজটিলতা ও আর্থসামাজিক সম্পর্কের বিন্যাস কৌশলের মাঝখানে মানুষের অসহায়তা, স্বপ্নভঙ্গ ও প্রত্যাশা — সব মিলিয়েই আখতারুজ্জামানের বাংলাদেশ তাঁর গল্পসম্ভার।

নরনারীর সম্পর্ক ও অনিবার্য অর্থে যৌনতা নিয়ে আখতারুজ্জামানের নিজস্ব কিছু ভাবনাচিন্তা ছিল। এঙ্গেলসকে মনে রেখে, মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের সময়কালে যৌনপ্রেম যেভাবে জেনেছি, সমাজপরিবর্তনের ধারায়, পুঁজিবাদের প্রবল আধিপত্যের পটে ব্যক্তি হয়ে ওঠে ব্যক্তিসর্বস্ব। যৌনতারও চেহারা, ধরন-ধারণ পাল্টে গেছে। প্রেম ও কামের সীমারেখা নিয়ে নতুন নতুন বিতর্ক হয়েছে। বাঁচার পক্ষে যৌনতা ও যৌনতায় বাঁচার সংকট বা উদ্ধার নিয়েও মতবিরোধ ও সত্যপ্রকাশ ঘটেছে। আখতারুজ্জামানের গল্পে যৌনতা বলি, যৌনপ্রেম বলি, নরনারীর সম্পর্ক বলি, তা তাঁর নিজস্ব ভাবনাচিন্তা থেকে উপস্থাপিত। সূত্রাকারে আমরা এখানে তা উল্লেখ করতে পারি।

> ১. Sex কে আমি কখনো glorify করতে চেষ্টা করিনি। আমি সেক্স এর পেছনে living মানে class কে দেখতে চাই, Society -কে দেখতে চাই, আর masturbation-এর কথাটা আমার লেখার শুরু থেকেই আছে, অনেকেই এটা নিয়ে আপত্তি তুলেছে। কিন্তু আমি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি।
>
> ২. আমি মনে করি একটা ছেলে যদি একটা মেয়েকে চুমু খায় এবং সেটা যদি অপ্রয়োজনীয় হয় তাহলে সেটা অশ্লীল, যে কারণে বাংলা সিনেমা অশ্লীল, যেখানে খামোখা একাট ছেলে মেয়েকে জড়িএয় ধরে। কিন্তু পাশাপাশি intercourse -এর detail description- অশ্লীল নাও হতে পারে যদি তা প্রয়োজনীয় হয়। masturbatuon-কে আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি কারণ এর ভেতর আমি Society-কেই দেখতে পাই। যে লোকটা masturbate করছে সে এক চূড়ান্ত loney man এবং unhealthy man এবং he is a product of unhealthy society. (‘স্বকণ্ঠ’, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ—সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত)।

আমরা বুঝতে পারি গল্পে বা উপন্যাসে যৌনতাপ্রসঙ্গ উপস্থাপনের আখতারুজ্জামান কখনোই ‘ব্যক্তি’ - তে থেমে যান না, পৌঁছে যান সমাজে ; সমাজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেন তাঁর ভাবনাকে। তিনি psychologically unhealthy মানুষের কথা বলেন; তিনি মানেন যৌনতা partner-এর দাবি করে। কিন্তু ‘যে লোক masturbate করছে তার মানে partner নেই।। লেখক সমস্যার গভীরে পৌঁছুতে চান। তিনি এমন সমাজ চান না যেখানে যৌনতা নিয়ে কোনো সংস্কার থাকবে। স্থান বা কাল, পরিপার্শ্বও তো যৌনক্রিয়ার ক্ষেত্রে অরহার্য প্রসঙ্গ। কিন্তু আখতারুজ্জামানের পর্যবেক্ষণ এরকমই তীক্ষ্ণ যে, ‘আড়ালের কথাটা কিন্তু মানুষের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে। হাতীরাও কিন্তু আড়ালে মিলিত হয়, বিড়ালও কিন্তু তেমন। শুধু ঐ কত্তা আর টিকটিকি ছাড়া বোধহয় খুব বেশি প্রাণই openly মিল হয় না।” আখতারুজ্জামানের ‘উৎসব’ গল্পে দেখেছি কুকুরের প্রত্যক্ষ অগোপন রমণক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় বাড়িতে গিয়ে চরিত্রপাত্রের স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম। শ্রেণীচেতনার সঙ্গে যৌনচেতনাকেও সম্পর্কিত করে দেখানোও লেখকের অনন্য শিল্পকৃতিরই নজির। এই সূত্রে মনে পড়বে শহীদ ইকবালের মন্তব্য—

> ইলিয়াস তাঁর চরিত্রে শ্রেণীভাবনাকে যৌনতার সঙ্গে জুড়িয়ে দিয়েছেন। একটা ক্ষেত্র বা রেঞ্জ থেকে তা নিয়ন্ত্রিত। ইলিয়াস যেটাকে বলেন Standard of living বা জীবনযাত্রার মাপকাঠি। এ মাপকাঠির বিবেচনার সে জীবনসঙ্গ যৌনসঙ্গীর কামনা করে। এ বিষয়গুলো নির্ভর করে সমাজমর্যাদা বা তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সফলতার ওপর। লেখক অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতায় কিংবা অবক্ষয়ী চেতনার আধারে মাস্টারবেশন প্রক্রিয়াকে শিল্পসিদ্ধ করে রুপ দেন। (কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস)

‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ গ্রন্থের নামগল্পে সমালোচকরা খুঁজে পান psychosexul disorder এবং তা মিথ্যে নয়। এই গল্পে কলকাতার ব্যাবসায়ী প্রদীপ অন্য রাষ্ট্রের, বাংলাদেশের বাসিন্দা, তাই ননীগোপালের বড়িতে এসে রাত্রিযাপন করতে গিয়ে তার ভ্রাতুস্পুত্র অমিতের বিছানার নিচে পর্ণোগ্রাফি খুঁজে পায়। পর্ণোগ্রাফিতে নারীদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকারপ্রকার দেখে তার যোনতাড়না জাগে। এ তাড়না দূরীকরণে একমাত্র উপায় মাস্টারবেশন। এদিকে পিসিমার গান কানে ভেসে এসে নিঃসঙ্গতা জাগে। আখতারুজ্জামান বর্ণনা দিচ্ছেন—

> অমিতের টেবিল থেকে পুরনো কাগজটাকে এনে তার ওপর মাস্টারবেশন করে দিলেই বাইটাকে একেবারে ঝোড়ে ফেলা যায়। কিন্তু এখন বিছানা থেকে নামা অসম্ভব। লেপটা কুন্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে পায়ের কাছে শালার শীতও গায়ে ঠিকমতো লাগছে না। পাজামার দড়ি খুলে ভেতরে নাড়াচাড়া করতে গেলে কুঁকড়ে থাকা ঠান্ডা শিশ্ন হাতে ঠেকে মরা বিছের মতো; সমস্ত গা ঘিনঘিন ছিমছিম করে ওঠে। তখন ডানহাতটা এনে মাথার কাছে রেখে দেওয়া ছাড়া সে আর কি করতে পারে? বাম হাতটা কোথায় রাখলে ভালো হয়— কিছুতেই বোঝা যায় না। এমন সময় পিসিমার গুঞ্জন বারান্দা দিয়ে গুটি গুটি পায়ে এসে ঘরেও উঁকি দিয়ে যায়, ‘পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ।’

এ গল্পে প্রদিপের স্বপ্নের জগৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, যৌনমনস্তত্বের শৃঙ্খলহীনতা সঙ্গী দাবি করে, গল্পের কৃৎকৌশলে সুঠাম বিন্যাসের তারতম্য ঘটলেও চরিত্রপাত্রের জীবনভাবনা লেখকের কলমে চমৎকার ফুটেছে।

আখতারুজ্জামান ‘ব্যক্তি’কে ‘ব্যক্তিবাদ’ -কে বরবাদ করেন না। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, ব্যক্তির হাত ধরে সমাজের হাতধরা সম্ভব তা তিনি জানেন। রুগ্ন ক্ষয়াটে যৌনকাতর বা পীড়িত মানুষ তাঁর গল্পের অবলম্বন। অপরদিকে শ্রেণীর প্রভেদ ও বৈষম্যও চিত্রিত করা তাঁর লক্ষ। প্রেম, যৌনতা বা নিঃসঙ্গতার বৃত্তে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রপাত্রের ভাঙচুরও দেখার বিষয়। ‘উৎসব’ গল্পে শ্রেণীচেতনা ও যৌনতাড়নায় যুগপৎ ব্যাপারটিও ধরা পড়েছে। এখানে আনোয়ার, কাইয়ুম, হাফিজ, পারভেজ, ইকবাল নানা স্তরের বন্ধু। কাইয়ুমের ধানমণ্ডির বাড়িতে আনোয়ার আমন্ত্রিত। কলেজের অধ্যাপক হাফিপ আনোয়ারের বন্ধু। বন্ধুগোত্রের ইঞ্জিনিয়ার পারভেজ। উৎসবের বাড়িতে ঝলমলে আলোর নতুন টাটকা রাস্তার পাশে এঁদো গলি - ঘিঞ্জি তাকে তাড়িত করে। নিজের স্ত্রী সালেহার প্রতি তার বিরক্তি চাপা থাকে না। ‘তার ক্ষোভ হয়, এই মেয়েটা বছর খানের হলেও তো কলেজে পড়েছে, বিয়ের আগে এমনকি একটু প্রেম মতোনও করলো। অথচ এমন জবুথুবু থাকে কেন? শাড়ীর ভেতর বুক নেই, পাছা নেই, দিনরাত হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা বেডপ কোলবালিশ।’ তবু ছোটঘরের স্বল্পশূন্যতায় উৎসব দ্যাখায় তার নিবিষ্টতা থাকে। এখানেও তার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ। আখতারুজ্জামান মানবপ্রবৃত্তি ও যৌনতার উৎস খোঁজেন উৎসবের সূত্র ধরে— ধানমন্ডির উৎসবের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরে আসার পথে, পুরনো ঢাকার গলিপথে সে লক্ষ করে— ‘ওদের গলির মুখে খিজির আলির বারেকখানির দোকানের গা ঘেঁষে, ১টা ল্যাম্পপোস্টের নিচে ১টি পুরুষ কুকুর ও ১টি মহিলা কুকুর যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। জনতা কুকুররতি দ্যাখার উৎসবে মুখর, তারা নানাভাবে কুকুরদের উৎসাহিত করে।’ এই দ্যাখার প্রতিক্রিয়ায় আনোয়ারের ভেতর যৌনতা গর্জায়—

> ঘরে ঢুকে আনোয়ার আলি দরজা বন্ধ করতে করতে খুব ভরা ও সম্পূর্ণ কণ্ঠে ডাকলো ‘সালেহা’।

> ঘুম ঘুম ভঙ্গিতে আদুরে ভঙ্গিতে সালেহা বলে, 'এতোক্ষণ তুমি কি করছিলে;
> এ্যাঁ? বাইরে কি হয়েছে বলো না।'
> বাইরে লোকজনের জটলা দেখে একটু মোড়ে গিয়েছিলাম।'
> বিছানায় শুয়ে 'আমার শেলী' বলে আনোয়ার আলি স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলো।
> 'এতো হৈচৈ কিসের এ্যাঁ, বলো না?'
> 'আর বলো না সেলী দুটো কুকুরের ইয়ে দেখে লোকজন শালা—!
> আনোয়ার আলির হাত থেকে রবারের পুরু গ্লাভস খুলে গেছে।
> চামড়ার আবরণটিও উঠে যাচ্ছে নাকি?
> 'রাত একটার সময় আর কাজ নেই, যতো সব ভালগার লোকজন।' সুখ ও উত্তেজনায় আনোয়ার আলির উত্তপ্ত কণ্ঠ থেকে, মুখ থেকে আঠলো ধ্বনি চুঁয়ে পড়ে।

এক্ষেত্রে আনোয়ার আলির নিচতা ও ক্ষুদ্রতা মাত্রাতিরিক্ত হওয়া ও শিল্পের সংযম ভেঙে পড়ার অভিযোগ উঠলেও, নির্দ্বিধায় বলা যায় গল্পের 'ন্যায়' কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কেননা প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে ক্রিয়াকর্মের যথার্থ উৎস ধরেই আখতারুজ্জামানের গল্প বুনতে বুনতে এগিয়ে যাওয়া।

'খোঁয়ারি' গ্রন্থের 'তরবারির মরদপোলা' যৌনতা ও মনস্তত্ত্বের শিল্প - সংযমেরই পরিচয় বহন করে। তারাবিবির অক্ষম স্বামী রহমান ও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত তারাবিবি, তারাবিরি পুত্র গোলজার ও তার সক্ষী সহিনা, কাজের মহিলা সুরুজের মাকে নিয়ে এই গল্প। সখিনা গোলজার সম্পর্কে নিয়ত বিরোধ তৈরিতে পটু তারাবিব সরুজের মাকে গোলজারের দখলদারি প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া অন্যরক, বৃদ্ধ রমজান আলির প্রবল উন্মাতেও তরবারির মন্তব্য যৌনবিজ্ঞানের সারসত্যকেই উন্মোচন করে—

> 'ঘরের মইদ্যে গুনা। ঘরের মইদ্যে শয়তানী। নামাজ - বন্দেগী আমাগো ক্যামনে কবুল হয়। চোপসানো গলায় রমজান আলি ফ্যাসফেসে শব্দ করে, 'আমাগো কুনো উন্নতি নাই, ক্যান? ঘরের মদ্যেই আমাগো শয়তানের কারখানা। বারোটা মাস আমি বিছানার উপরে পইড়া থাকি ক্যান? হারামজাদা আহুক, আইজকা রাইতেই আর পাছার মইদ্যে লাথ মাইরা যুদিল খ্যাদাইয়া না দেই।' 'হইছে'। তারাবিবি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে স্বামী থামিয়ে দেয়, 'এমুন চিল্লামিল্লি করো ক্যালায়? গোলজারে কি করছে? পোলায় আমায় জুয়ান মরদ না একখানা? তুমি বইনা মড়টা, হান্দইয়া গেছো কব্বরের মধ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝবা ক্যামনে?

এখানে তারাবিবির যৌনঅতৃপ্তি ও যন্ত্রণা, বয়সোচিত যৌনতার স্বাভাবিক, প্রকাশের পক্ষাবলম্বন, বৃদ্ধ রমজান আলির অক্ষমতার প্রতি কটাক্ষ সব মিলিয়ে জীবনবাস্তবতার অনিবার্য শিল্পায়ন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। অবশ্য অন্যভাবেও সমালোচকদের ভাবনা জানা যায়—

> লেখক টিনের দরজা ফুটো দিয়ে চোখ গলিয়ে তারাবিবির সংসারকে অনুসন্ধানী গোয়েন্দার চোখে পর্যবেক্ষণ করেন নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। এক সময়ে অসম যৌনতার শিকার তারাবিবি চরিত্রে খানিক ভোগ অতৃপ্তিজাত ক্ষোভ ও বিকৃতি পাখা মেলে উড়তে থাকলেও আধা পুঁজিবাদী সমাজ-অভ্যন্তরে নারীর যৌনবৈষম্যের চিত্রটি হাড়মজ্জা কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। সুতরাং ভোগবাদী নপুংসক সমাজে উঁচুস্তরের অধিষ্টিত পুরুষেরা এই গল্পের শেষ মাথা পর্যন্ত তারাবিবির অশ্লীলতার বিমুগ্ধ চাবুকের ঘা খেতে থাকলে তাদের হৃদপিণ্ড মাটিতে হাড়লে লাফাতে লাফাতে রক্তাক্ত হয়।
>
> (এজাজ ইইসুফী)

কুন্দেরা প্রভাবিত আখতারুজ্জামান মাস্টারবেশন, নিঃসঙ্গতা, শ্রেণীচেতনা ও যৌনকল্পনা যৌন-বাস্তবতার পারস্পারিক সম্পর্ক নানাভবে তাঁর গল্পে দেখাতে চান। নিছক যৌনতা বা সমকামিতা তাঁর গল্পে আসে না, শিল্পসিদ্ধির প্রশ্নে তিনি জানেন জীবন অনেক গভীর ও ব্যাপক; উপরিতলটাই জীবনের সব নয়, সর্বস্ব নয়। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গ্রন্থের রঞ্জুকে নিয়ে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' আমাদের কাছে তীব্র স্পষ্ট না হলেও তার নিঃসঙ্গতা অধরা থাকে না। এ গল্পের ধাঁচা আদ্যন্ত ইলিয়াসী নয়, কিন্তু বিপন্ন অনুভূতির নির্দেশক। 'প্রেমের গপ্পো' - তে বুলাকে তার প্রাক - বিবাহ প্রেমের গল্প শোনাতে শোনাতে জাহাঙ্গীর মজা, উৎকণ্ঠা, নারীপুরুষ সম্পর্ক বোঝায় খানিকটা সরলমাত্রিকতায়; বুলার প্রতিক্রিয়াই এখানে দেখায় বিষয়। রোমান্টিকতা, যৌনতা ও সমকামিতার ত্রিমাত্রিক মিশ্রণে 'চিলেকোঠায়' শিল্পের রসায়নে এক অন্যপ্রকার বাস্তবের জন্ম দেয়। সোফিয়া, হাসান নীলরঙের প্যান্ট ও শাদা সার্ট পরিহিত ছেলে যেন নানা বাস্তবের চরিত্র। সোফিয়াকে কেন্দ্র করে হাসানের ভাবনাই এখানে অনেকখানি; সোফিয়া হারিয়ে যায়, সে কি স্বপ্নে ছিল, নাকি মনোলোকে। এবার ছেলেটিকে নিয়ে—

> ছেলেটা বিছানায় বসে প্রথমে হাসানের কোমরে, পরে আস্তে নিচে হাত বুলোতে লাগলো।

> সেই সরু আঙুলগুলো থেকে কী ভয়ানক রক্ত প্রবাহিত হয়। হাসান দ্যাখো, হঠাৎ সে ছেলেটার নোনতা গালে প্রবল ভাবে চুমু খেতে শুরু করেছে। ছেলেটা তখন হাসানের জন্যে নিজের প্যান্ট খুলে উপুর শুয়ে পড়ে। হাসান দেখতে চাইলো প্যান্টের রঙ ঘন নীল, কিন্তু অন্ধকারে ছিছু বোঝা যায় না। মধ্যরাত্রে বাইরে বিপুল জ্যোৎস্না অনন্ত আকশের প্লাবন বয়ে যায়, আর চিলেকোঠায় ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে অন্ধকারের চরম সুকে সাধে হাসান তাকে নিবিড় করে কাছে টানে।

কিন্তু এ গল্প ব্যক্তিগত থাকে না শেষপর্যন্ত, আত্মরতিপরায়ণ মনে হয় না। হাসানের জন্মান্তর ঘটে। 'অতীতকালের গোপন খাপ থেকে বেরিয়ে আসা হাসানের সময় - ছোঁয়া, সময়ের পর্ব-পর্বান্তর ছোঁয়া গভীর অনুভবের হাসান হয়ে ওঠা' এ গল্পের কাছ থেকে মস্ত পাওনা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পসম্ভার বহুমাত্রিক। নিছক ব্যক্তিচৈতন্যের মোড়কে ঢেকে তাঁর চরিত্রপাত্র উপস্থাপিত হয় না। সমাজবাস্তবতা, আর্থসামাজিক সংকট, সাম্প্রদায়কতা, রাজনীতিও অনিবার্যভাবে তাঁর গল্পে রয়েছে। তীব্র সমাজসচেতন মার্কসীয় প্রজ্ঞার অধিকারী আখতারুজ্জামান 'বাংলা ছোটগল্প কি মরে যাচ্ছে?' —শীর্ষক আলোচনায় জানিয়েছিলেন —কেন একটি সমস্যাকে কেন্দ্রবিন্দু করে একরৈখিক আলোর পক্ষে দিন দিন কঠিন হয়ে পড়েছে। একটি মানুষকে একটি মাত্র অনুভূতি বা সমস্যা দিয়ে চিহ্নিত করা এখন অসম্ভব।' তাই নিছক যৌনসমস্যাই তাঁর গল্পের আশ্রয় নয়। মুক্তিযুদ্ধ, পায়ের নিচে মানুষ ও প্রতিরোধ কিংবা সংখ্যালঘুর স্বর কিংবা হাভাতেদের অসুখবিসুখ বা আমৃত্যু আজীবন—এ ধরনের বিন্যাসের বিভাজনেও আখতারুজ্জামানের 'গল্পসংগ্রহ' প্রকাশিত হলেও তাঁর গল্পের নানামাত্রিকতা ধরা পড়ে।

'অন্য ঘরে অন্য স্বর' কিংবা 'খোঁয়ারি' গল্পে আখতারুজ্জামান এই উপমাহাদেশের ট্রাজিক প্রসঙ্গ, দেশভাগের প্রেক্ষাপট মনে রেখে সংখ্যালঘু জীবনযাপনকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছেন। এই দুটি গল্পে হিন্দু minority-র ব্যাপার এসেছে। সংখ্যালঘুর প্রসঙ্গে ও সূত্রে তাঁর ধারণা এরকম—

> ১। এখানে হিন্দু Supressed আমি সেটাই বলতে চেয়েছি।
>
> ২। যে দেশে Jew Supression আছে সেখানকার লেখকরা তাই নিয়ে লিখবেন।
>
> ৩। যে মুহূর্তে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করা হচ্ছে, সেই মুহূর্তে হিন্দুরা 2nd Class Citizen হয়ে যাচ্ছে।
>
> ৪। সাম্প্রদায়িকতা ভারতে আরো বেশি আছে। কিন্তু সেখানে আবার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়বার শক্তিও প্রচুর আছে।
> এখানকার হিন্দুদের সে শক্তিটা না থাকার প্রধান কারণ এখানকার হিন্দুদের অর্থনীতির উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।
>
> ৫। Basically বাঙালিত্বে কোনো প্রভেদ নেই। হাজার বছরের সংস্কৃতি এটা। তবু ৪০ বছরের আলাদা দুটো state.

এসব ভাবনা আছে বলেই উল্লিখিত গল্পদুটি ভিন্ন তাৎপর্য পেয়েছে। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে একদিকে যেমন যৌনতাড়না মাস্টারবেশনের চিত্র আছে, মনস্তত্ত্ব আছে, তেমনি আছে প্রদীপ-পিসিমা-মানসী-গোপালদের সংখ্যালঘুর সামাজিক সমস্যা। কেউ বলবেন এসব কারণেই গল্পটি 'লণ্ডভণ্ড' হয়ে গেছে, কেউ বলবেন স্বরান্তরের গল্প হয়েছে। 'খোঁয়ারি' গল্পের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সংখ্যালঘু সমরজিৎ তাদের বাড়ির নিঃসঙ্গ রক্ষক, তার বাবা অস্থিরতা অনিশ্চয়তার কারণে খোঁয়ারিতে থাকেন; সমরজিতের রাজনৈতিক বন্ধু জাফর, মূল্যবোধহীন ইফতেখার ও স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক পোষাক পরা ফারুক। সমরজিৎদের প্রাসাদোপম বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোর ভাড়া নেবার জন্য বহিঃশক্তির রাজনৈতিক কোণ থেকে প্রবল চাপ প্রমাণ করে minority supression দেশভাগ, দাঙ্গার আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে মুক্তিযুদ্ধের কথা মাঝে হুইস্কির আড্ডায়, রাজনৈতিক অবক্ষয়, অনৈতিকতা, স্বার্থপরতা ফুটে ওঠে। সংখ্যালঘুর কণ্ঠস্বর খাটো হয়ে যায়। চরিত্রগুলির কথাবার্তা থেকে বুঝে নিতে পারি সংখ্যালঘুর নিরাপত্তাহীনতা। যেমন—

> 'এনিওয়ে' ফারুক বসে পড়লো একেবারে সোজা হয়ে 'আমাদের তো আর রাজনৈতিক সংগঠন নয়, আমাদের ভয় পাওয়ার কি আছে? আমাদের পিত্তর ইউথ ফ্রন্ট, আমরা মন্ত্রীত্ব চাই না, এমন কী উই রিফিউজ এ সীট ইন দ্য পার্লামেন্ট। আমরা শুধু দেখবো সাবভারসিভ এলিমেন্টস বিপ্লবের নাম করে কিংবা গভর্নমেন্টের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশকে ধ্বংস করতে না পারে। নট ওনলি দ্যাট, আমরা অ্যালর্টা থাকব যাতে কোরাপ্ট লোকজন আমাদের ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে ঢুকে রেইন করতে না পারে'।

স্বার্থান্ধ ধান্দাবাজ ফারুকের এই উক্তিতে সংখ্যালঘুর নিশ্চয় নিরাপত্তার হদিশ নেই। কিংবা অমৃতলালের

কথায় জাফরের ভ্যাংচানি, বাড়ি ভাঙার ক্ষেত্রে ফারুকের ম্যানেজ করা—এ সবই সম্ভাব্য পরিণামের ইঙ্গিত দেয়; রাজনৈতিক চাপে সমরজিৎ ও অমৃতলালের বাড়ি আগলে রাখার প্রাণপণ মার খেতে থাকে; অমৃতলালের করুণাপুষ্ট সাহায্যপুষ্টরাই আজ রাজনৈতিক নেতৃত্বে, আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধি। যথার্থ মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলি রাজনৈতিক রঙে চুবিয়ে উচ্চাকাঙ্খাপূরণের যাবতীয় অনৈতিক প্রক্রিয়ায় তৎপর হয়েছে। ফলে অমৃতলাল - সমরজিৎদের হয়রানি, উৎকণ্ঠা, অস্থিতিশীলতায় আক্রান্ত হতে হয়। আখতারুজ্জামান নির্মম সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না, অনেকটাই চাবুকের মতো বিন্যস্ত অক্ষরমালা আর সংখ্যালঘুর কণ্ঠস্বরের বিপন্নতা শোনাতে থাকেন।

'দুধেভাতে উৎপাত' গল্পে আখতারুজ্জামান শ্রেণীসমাজে গ্রামীণ অর্থনীতির জটিলতা, গ্রামবাংলার মুসলিম সমাজের আশাআকাঙ্খার অপূর্ণতার যন্ত্রণা ও স্বপ্নে বাঁচার কথা জানান। দুধভাত খাওয়ানোর দুর্মর আকাঙ্খায় শয্যাগত জয়নারে উচ্চারণ 'বুইড়া মরদটা! কি দ্যাহস? গোরু লইয়া যায় খাড়াইয়া খাড়াইয়া কি দ্যাহস।' কিন্তু কোথায় গোরু। হারুণ মৃধাদের শোষণের জাল বিছানো ব্যবস্থায় বাঁচার আশ্বাস কোথায়? ওহিদুল্লা, আহম্মদউল্লা, খাদিজা ও আরো অনেকে হামিদা বিবির সানকির দিতে তাকিয়ে বাঁচার উপায় খোঁজে। প্রবাসী স্বামীর প্রতি জয়নারে আক্রোশ ও রোষ, হারুণ মৃধার নিকট গাই বন্ধক দেওয়ায়। একদা সম্পন্ন জয়নারের সংসার এখন অর্থক্লিষ্ট। শ্রেণীবাস্তব ও অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের সন্তানদের দুধেভাতে রাখবার ইচ্ছা ও অবস্থার সংগতি 'দুধেভাতে উৎসব' গল্পের সমাজবাস্তবতার সাহিত্যায়ন ঘটায়।

'পায়ের নিচে জল' আখতারুজ্জামানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। যমুনাচরের প্রভাবশালী আলতাপ মৌলবির সাহায্যকাতর কর্মপ্রার্থী অসংখ্যা মানুষ যমুনাচরের ভাঙনে তার নিঃস্ব। আতিক জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ক্রেতা আলতাফ মৌলবি, বর্গাচাষীদের এ সিদ্ধান্ত জানাতে আতিকের আশা। এইসব মৌলবি ধর্মকে পণ্য করে, জোতদারি করে, তাঁর এক ছেলে গেছে মিডলইস্টে, এক ছেলে ডিস্ট্রিক্ট ফুড - অফিসের ক্লার্ক'। অপরদিকে খোলা আকাশের নিচে 'বান্দের জমিদ্দার' আকালুরা। নদী এগোয় জমি গ্রাস করতে করতে। বাঁধের উপর নিঃস্ব মানুষেরা, পায়ের নিচে জল। বর্গচাষীদের কথায় অত্রতিকের ভাবপ্রবণ হয়ে পড়া ও শহরপথে যাবার উদগ্রতায় গল্প বাঁক নেয়। অপরদিকে বাঁধেই তো সারবাঁধা নতুন ও পুরানো চালাঘর। আখতারুজ্জামান বর্ণনা দেন—

> নিচে চরের ওপারে নদীর ভেতর থেকে মেঘ ডেকে উঠলো। আলতাফ মৌলবি বলে, 'আতিক শুনেছো নদী দৌড়ায়।' তার মানে এই বাঁধে আরো লোক আসছে। এরপর উঠে আসছে কিসমত আর আকালু আর কিসমতের বৌ আর কিসমতের বড়ো ছেলে আর বড় ছেলের বউ আর কিসমতের নাতি আর কিসমতের পঙ্গু ছেলে আসমত আর— এদের ধ্যাবড়া পায়ের কাণ্ডজ্ঞানহীন চলাচলে বাঁধের ফাঁটলে চিড় ধরবে, চিড় পরিণত হবে মস্ত মস্ত হাঁ - তে। যমুনার কোলে কাঁকে এরা মানুষ, যমুনার হাভাতেপনা কি এরা দেখেও দেখে না?

'সমাজের নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া'র দিকে নজর - দেওয়া গল্প 'পায়ের নিচে জল।' এ গল্প প্রবল শ্রেণী - চেতনার, এ গল্প গ্রামবাংলার নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার।

আখতারুজ্জামান Emotion -কে Sentiment -এ পরিণত হতে দেন না। ফলে প্রতিবাদ প্রতিরোধ তাঁর গল্পে ব্যাপক না হলেও আছে। 'যুগলবন্দি' প্রতিশোধ দখল-এর পাশে 'কীটনাশকের কীর্তি -ও উজ্জ্বল। 'পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের চালচিত্র' এ গল্পে পাওয়া গেছে। এ গল্পের প্রথম নাম ছিল 'অবিচ্ছিন্ন। এর নামকরণ পরিবর্তন যে বেমানান, এরকমই অনেকের মনে হয়েছে। গ্রাম থেকে আসা রমিজ কাজ করে তার ধনাঢ্য পুঁজিপতি মালিকের কাছে। সিঙ্গাইর গ্রামে বাস করে, তাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে তার মা বাবা আর বোন আসিমুন্নেসা। অন্নদাতা হাজি কিসমত মৃধার ছেলে 'ম্যাট্রিক পাশ' নামধারীর ভোগলালসার শিকার হয় অসিমুন্নেসা। নিরুপায়, অর্থনীতির ও অনৈতিকতার যৌথ আগ্রাসনে, দাপটে ম্যাট্রিক পাশের ইচ্ছায় হাফিজুদ্দিনের সাথে বিবাহ হয়ে যায় আসিমুন্নেসার। তবু রেহাই পায় না আসিমুন্নেসা। অর্থের দাপটে, ম্যাট্রিক পাশের ব্যাভিচারিতায়, সমাজের অবিচারে আত্মহত্যা করে অসিমুন্নেসা। রামিজ সংবাদ পায়। পুঁজিপতি মালিকের মেয়ে শম্পার প্রতি তার বিরুদ্ধতা জমে ওঠে। বেগম সাহেবার কাছে সে বিচারও পায় না। কীটনাশক নিয়ে শম্বার ওপর তার আক্রমণ ব্যর্থ হয়। গ্রামনগরের অর্থনৈতিক ভিন্নতা দেখান লেখক, বোঝান রামিজের মতো অসহায় চরিত্রের মনস্তত্ত্ব। 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পের বহুমাত্রিকতা নিয়ে সংশয় থাকে না। স্বাভাকক্রমেই এজাজ ইউসুফী 'কীটনাশকের কীর্তি'-র তাৎপর্য খোঁজেন এইভাবে—

> 'কীটনাশকের কীর্তি' শিরোনামটি এদেশের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আজ পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত ঢুকে পড়া বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কীটনাশক, সার, ইলেকট্রিক বাল্ব কি টিভি, ভিসিয়ারের ক্রম প্রসারমান বাজার সৃষ্টির চেষ্টাটি খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমাবেশে একটি অখণ্ড চিত্র হয়ে ওঠে এই গল্পটিতে। সঙ্গে শহুরে উচ্চবিত্তের জীবনের ছবিটি চলচ্চিত্রের মতো প্রতিফলিত হয়। আমাদের ভাবতে বাধ্য করে এদিকে গ্রামগঞ্জে পর্যন্ত এনজিও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর তেজারতি কারবার

> অন্যদিকে শহুরে উচ্চবিত্তের পাশ্চাত্য কি আমেরিকান ইয়াংকি সংস্কৃতির মিশেলে গড়ে ওঠা লিপস্টিক সংস্কৃতির খাসলত রপ্তকরণের অর্থহীন চেষ্টা। বিপরীতে দেশের শ্রমজীবী মানুষের অনৈক্যের কথাও এই 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পটি।
>
> 'দোজখের ওম' গল্পের মধ্যে দিয়ে আখতারুজ্জামান জীবনকে মৃত্যুর কাছ থেকে জীবনেই ফিরিয়ে দেন; নেতিবাচকতা থেকে ইতিবাচকতায়। তাঁর এ গল্প মনে পড়ায় গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজকে মৃত্যুচিন্তা ছিল তাঁর আজীবন, নিঃশ্বাসে যে প্রবাদ 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' ফেরারি' 'পিতৃবিয়োগ' 'কান্না' —মৃত্যুও জীবনের আমৃত্যু আজবীনের গল্প। আখতারুজ্জামানকে মৃত্যু 'হন্ট' করেছে। তিনি বলেন, 'এটাকে একধরনের Psychological Preparation for Death বলতে পারো। মৃত্যু নিয়ে লিখি আমি হয়তো মৃত্যুর ভয় কাটাতে চেষ্টা করছি।' ১৯৯২ -এর 'লিরিক' বিশেষ সংখ্যায় তিনি কবুল করেছেন ধর্ম তাঁর কাছে কোনো factor নয়। 'মৃত্যুর ভয় কাটাতে চেষ্টা করছি।' 'মৃত্যুর পরের ব্যাপারটা আমার কাছে totally dark...যা হোক মৃত্যুচেতনার crisis solve করবার উপায় আমার কাজ। তবে মৃত্যু নিয়ে ভাবতে গিয়ে একথা আমার বারবার মনে হয়, সেটা হলো, মানুষের অন্ততপক্ষে ৩০০ বছর বাঁচা উচিত'। এই উক্তির মধ্য দিয়েই তাঁর মৃত্যু - চেতনার ভিতর থেকেই ঠিকরে আসে প্রবল জীবনচেতনা।

বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত মৃত্যুর প্রহর গোনা দর্জি কামালউদ্দিন স্ত্রী - পুত্রকন্যার মৃত্যুতে বিহ্বল, শোকগ্রস্ত। তবু স্বপ্ন দেখা শেষ হয় না, ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন, দোজখ কিংবা বেহেশতের। কামালউদ্দিন জানে না কোন্ পাপে এত মৃত্যু দেখা। স্বামীহীনা খোদেজা কামালউদ্দিনের আশ্রয়ে দিন যাপন করে, সে জানে বাপের মৃত্যুতে দু'ভাই তাকে উৎখাত করবে এই বসতি থেকে। এ গল্পে পুত্র আকবরের মৃত্যুদিনে রুহের মাগফেরাতের আয়োজন হলো অনেকেই আমন্ত্রিত হয়ে আসে, আসে হানিফের মা। পাঁচ বছর পাশ ফিরে শুতে না পারা কামালউদ্দিনকে বলে, 'তুমি অহনতরি বাঁইচাই আছো?' পারভীন তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কী দাদা?' —এরপর নিয়ত মত্যুকামনাতুর কামালউদ্দিনকে নিয়ে লেখকের বিবরণ—

> পারভীনের একটি হাত তার সচল হাতের ভেতর দযি়ে কামালউদ্দিন বলে, 'সিধে হইয়া খাড়া'। নাতনীকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য তার হাতে সে একটু ঠেলাও দিলো। যাবার জন্য পা বাড়িয়ে হানিফের মা বলে, 'খবর দিও। বাঁইচা আছো একটা খবর ভি পাই না।'
>
> বাঁচুম না ক্যালায়? কামালউদ্দিনের এই বিড়বিড় ধ্বনি ভালো করে শোনবার জন্য হাফিের মা মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো। দ্যাখে ডান হাতে ধরা লাঠিতে ভর দিয়ে কামালউদ্দিন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। পরভীন চট করে এগিয়ে না ধরলে সে ঠিক পড়েই যেতো। লাঠি এবং নাতনীর ওপর ভাঙাচোরা শরীরের ভার রেখে ডানদিকের গতর ছ্যাঁচড়াতে ছাঁচড়াতে সে রওয়ানা হলো নিজের ঘরের দিকে। ঠোঁট, জিভ ও গলার সচল অচল ও নিমচল ঠুকরোগুলো জোড়াতালি দিয়ে কামালউদ্দিন একটা লাল-বলকানো হুঙ্কার ছাড়ে, 'তর চাচারে কইস, দাদার আহন তরি বাঁইচা আছে।'

মৃত্যুর দিক থেকে জীবনের দিকে বাঁচার ইচ্ছায় কামালউদ্দিনের হুঙ্কার, 'তর চাচারে কইস, দাদার অহন তরি বাঁইচা আছে।' —আখতারুজ্জামানের এ জীবন পিপাসা জীবনাকাঙ্খা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও ছিল।

আখতারুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিত নিয়মে কয়েকটি গল্প লিখেছেন— 'রেইনকোট' 'অপঘাত' জল স্বপ্ন স্বপনের জাল' 'মিলির হাতে স্টেনগান'। লেখক বলেন—

> মুক্তিযুদ্ধ খুব ইতিবাচকভাবে আসেনি। আসলে মুক্তিযুদ্ধের পরে সময়টা তো চরম frustrating মুক্তি নিয়ে আমাদের দারুণ স্বপ্ন ছিল। সে কী সীমাহীন স্বপ্ন। এত স্বপ্ন দেখার তো মানে হয় না। মুক্তিযুদ্ধ তো তেমন organised কিছু ছিলো না। তা ছাড়া এর defenite কোনো goal- ও ছিলো না। সাধারণ মানুষ বা কৃষকেরা যে যুদ্ধ করেছিলো তা কোনো আদর্শ থেকে করেনি। করেছে তার কারণ না করলে তারা মারা পড়তো। আর মুক্তিযুদ্ধের পরের সময়টা তো চরম স্বপ্নভঙ্গের কাল।

কিন্তু তাঁর কাছে এই সত্য ধরা পড়েছে মুক্তিযুদ্ধের ভেতরে Positive হল মানুষের সাহস, সে এক তুলনাহীন সাহস। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের কাল স্বপ্নভঙ্গের কাল, বিশ্বাসভঙ্গের। কোনো ইতিবাচকতা নেই তা নয়। আমাদের স্বাধীনতা - উত্তর দেশের মতনই ওখানেও একই সংকট, সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ও অপ্রাপ্তির বেদনা। মুক্তিযুদ্ধোত্র স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিপথগামী তরুণদের দেখা যাবে, 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পে।

আব্বাসপাগলার জবানবন্দিতে উঠে আসে বিপথগামী যুবকদের কার্যকলাপ, অরাজকতা, সব অপরাধ ফাঁস করে দিতে থাকেন লেখন, আব্বাস পাগলার বয়ানে। সুস্থ হয়ে উঠলে আব্বাস স্টেনগান নিতে চায় না, যে ইতিপূর্বে অহোরহ চেয়েছেন; সেই স্টেনগান মিলির হাতে দেখা যায়। সমালোচক বলবেন, 'গল্পে সামাজিক বিনাশ মূর্ত হলেও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রতিবাদ নিভতে দেন না। এবার রাজার বোন মিলির স্টেনগান হাতে ধরে। সবকিছু যে শেষ হয়নি তা টের পাওয়া যায়, মিলির স্টেনগান নিয়ে নিজের পায়ে আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়ালে।' লেখখ এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের উত্তাপ দেন পাঠককে, প্রত্যাশায় উজ্জ্বল করে তোলেন, জীবনও অনিঃশেষ টের পাওয়া যায়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভাষাদর্শ, গদ্যকৌশল, আঞ্চলিক ভাষা, ইংরেজি শব্দ ব্যবহার, বাগধারা, জোড়শব্দরাজি, কথাগ্রন্থনা তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয়বাহক। শহী ইকবাল দাবি করেছেন। 'আঙ্গিক নিয়েই ইলিয়াস। বর্ণনার মাঝে বেরিয়ে আসে চরিত্র এবং তার জীবনাগ্রহ।

বভানার পরিগুলে প্রখরত্ব দানা বেঁধে ওঠে। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে, শ্লোকে প্রবাদে সারাক্ষণ তটস্থ চরিত্রগুলো। ইলিয়াসের কবিত্ব আছে, কল্পনাশক্তি আছে, কিন্তু এর প্রয়োগবিধি সচেতন ও সমাজাশ্রিত। এমন আঙ্গিক বাংলাদেশের সাহিত্যের বিরল।' (কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস)। আখতারুজ্জামানের শিল্পশৈলীর বিচার বিশ্লেষণে স্বতন্ত্র পরিসর প্রয়োজন। নাইজেরিয়ার সাহিত্যিক চিনুয়া অ্যাচিরি বা লাতিন আমেরিকার গার্সিয়া মার্কেজের কথাসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য ও তাঁর অবিগত। সামগ্রিক উত্তরাধিকার অর্জন সত্ত্বেও তিনি স্বকীয়; হাসান আজিজুল হক ঠিক বলেছেন, আখতারুজ্জামান সাহিত্যের সীমানাটাকে পার হয়ে নতুন একটা সীমানা টানার কাজ হাতে নিয়েছিলেন, তার জরিপ হোক, ভাষা - সংলাপ - বর্ণনা—সবকিছুরই। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পবিশ্ব নতুন নতুন পাঠের প্রতিই ইঙ্গিত দেয়, বিরল প্রজাতির এই কথাকার এতটাই সম্পন্ন।